স্মরণীয় যাঁরা

ড. বিজিত ঘোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পুনশ্চ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যে পাতায় যিনি আছেন

- ১. রামমোহন রায় ৯
- ২. ডিরোজিও ১১
- ৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩
- ৪. কাঙাল হরিনাথ ১৫
- ৫. রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭
- ৬. প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯
- ৭. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২১
- ৮. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩
- ৯. ভগিনী নিবেদিতা ২৫
- ১০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭
- ১১. সরলাদেবী চৌধুরাণী ২৯
- ১২. সরলাবালা সরকার ৩১
- ১৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩
- ১৪. হরিনাথ দে ৩৫
- ১৫. বারীন ঘোষ ৩৭
- ১৬. রাসবিহারী বসু ৩৯
- ১৭. কানাইলাল দত্ত ৪১
- ১৮. প্রফুল্ল চাকী ৪৩
- ১৯. মেঘনাদ সাহা ৪৫
- ২০. সূর্য সেন ৪৭
- ২১. সুনির্মল বসু ৪৯
- ২২. যতীন দাশ ৫১
- ২৩. প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৩
- ২৪. দীনেশচন্দ্র মজুমদার ৫৫
- ২৫. বিনয়কৃষ্ণ বসু ৫৭
- ২৬. নলিনী দাস ৫৯
- ২৭. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৬১
- ২৮. বাদল গুপ্ত ৬২

রামমোহন রায়

ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়ের জন্ম হয় ১৭৭২-এর ২২ মে, হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে। এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে। প্রথমে তাঁদের উপাধি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে এঁরা 'রায়' পদবি প্রাপ্ত হন। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়। মাতা তারিণী দেবী।

অনন্যসাধারণ মেধা আর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন রামমোহন। মাত্র ১২ বছরের মধ্যেই তিনি আরবি ও পারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই রামমোহন সংস্কৃত ভাষাসহ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সংস্কৃত, আরবি, পারসি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, তিব্বতি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে ভারতবর্ষ থেকে দুর্গম হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বতে চলে আসেন। ভারতের মতো তিব্বতে এসেও তিনি দেখেন ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার। অত্যন্ত নির্ভীক ও দুঃসাহসী রামমোহন ভারতের মতো এখানেও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বয়সে নবীন, জ্ঞানে প্রবীণ রামমোহন, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ২০ বছর বয়সে বাড়ি ফিরে আসেন।

স্বদেশে ফিরে সমাজের সমস্ত কু-প্রথা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তিনি। হিন্দু সমাজে বহুযুগ ধরে প্রচলিত ভয়াবহ অমানুষিক সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি রুখে দাঁড়ান। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে, শেষ পর্যন্ত আইন পাস করিয়ে এই জঘন্য প্রথা তিনি বন্ধ করে দিতে সমর্থ হন। কেবল সতীদাহই নয়, সমস্ত রকম কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি।

ধর্মের নামে অন্ধতা, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতা থেকে তিনিই প্রথম মুক্তির পথ দেখান অন্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে। রামমোহন ছিলেন নবজাগরণের প্রথম নেতা। ভারতের কুসংস্কারের মুক্তিদাতা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নতুন যুগের সূচনা করেন তিনি।

বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক, সুপণ্ডিত রামমোহন ছিলেন বাংলা গদ্যেরও প্রবর্তক। একাধিক গ্রন্থও রচনা করে গেছেন তিনি। এই দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার, রামমোহনের অন্যতম প্রধান কর্মকীর্তি। ১৮২৩-এর ১১ই ডিসেম্বর রামমোহন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট -কে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখেছিলেন, ভারতে ইংরেজি শিক্ষা, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার পথ তাতেই সুগম হয়েছিল। এ-কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

১৮৩৩-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল নগরে মস্তিষ্ক প্রদাহে মৃত্যু হয় এই মহান মানুষটির।

ডিরোজিও

মহান শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও জন্মগ্রহণ করেন ১৮০৯-এর ১৮ই এপ্রিল (মতান্তরে ১০ই এপ্রিল)। কলকাতার এন্টালির পদ্মপুকুরে। ১৫৫ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে। তাঁর পিতার নাম ফ্রান্সিস ডিরোজিও। মাতা সোফিয়া জনসন।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও জাতিতে ছিলেন দ্বিক্ষণ পোর্তুগিজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গি। তবু বাঙালি সমাজেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থায়ী আসন করে নেন।

বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণের উপর ডিরোজিও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সেই তরুণদল ইতিহাসে 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত। ডিরোজিওর সুযোগ্য, কৃতী ছাত্রগণ 'ডিরোজিয়ান' নামেও খ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৬-৮৫), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) প্রমুখ।

ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে। তৎকালীন নব্য শিক্ষাধারার সবচেয়ে খ্যাতিমান শিক্ষক (এবং সুকবিও) ডিরোজিও ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক।

তাঁর ৮ বছর ছাত্র-জীবনের পর আর মাত্র ৮ বছর কর্ম-জীবন। ১৮০৯ থেকে ১৮১৪ ডিরোজিওর স্কুল-পূর্ব বাল্যকাল। ১৮১৫ থেকে ১৮২৩ তাঁর শিক্ষাকাল। এরপর ১৮২৬-এর মার্চ মাসে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে নিযুক্ত হন। চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক পদে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার জোরে চুম্বকে লৌহ আকর্ষণের মতো অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁর মতো সংস্কারমুক্ত মনের যুক্তিবাদী মানুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছেন। ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

১৮৩০-এ ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 'হেসপারাস' নামে আরও একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ডিরোজিও। ১৮৩১-এর ১লা জুন থেকে ডিরোজিওর সম্পাদনায় 'ইস্ট ইন্ডিয়ান' নামের দৈনিক কাগজটি প্রকাশিত হতে থাকে।

মাত্র ২২ বছরের জীবনে ডিরোজিও তাঁর শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করে দিয়েছিলেন, যা তাঁদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। চারটি কাব্যগ্রন্থও লিখেছিলেন ডিরোজিও। তার মধ্যে 'পোয়েমস্' (১৮২৭), বিশেষ করে 'দি ফকির অফ জাংঘিরা' (১৯২৮) খণ্ডকাব্যটি ছিল অসাধারণ।

১৮৩১-এর ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ডিরোজিও তদানীন্তন দুরারোগ্য কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। ৯দিন রোগভোগের পর ২৬শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৭-র ১৫ই মে। কলকাতার জোড়াসাঁকোয় বিশিষ্ট ধর্মজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করেন। তারপর ১৮৩১-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।

কর্মজীবনে জমিদারি বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার কাজের মধ্যেও ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৮৩৯-এর ৬ই অক্টোবর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ব-রঞ্জিনী সভা'। অবশ্য দ্বিতীয় অধিবেশনেই সভার নাম পাল্টে 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা' রাখা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য ১৮৪০-এ দেবেন্দ্রনাথ অবৈতনিক 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন। ১৮৪৩-এর ২১শে ডিসেম্বর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হন। ১৮৫৩-তে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন। ১৮৫৯-এ ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি। ১৮৬৭-তে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দেবেন্দ্রনাথ মাঘোৎসব (১১ মাঘ), নববর্ষ (১লা বৈশাখ) ও দীক্ষা-দিন (৭ই পৌষ) নামে কতগুলো উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন।১৮৭৬-এ বীরভূমের ভুবনডাঙা নামে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড কিনে আশ্রম স্থাপন করেন দেবেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে সেই ভুবনডাঙা শান্তিনিকেতন নামে ও সেই আশ্রমটি বিশ্বভারতী নামে বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে।

সে যুগে সমাজ-সংস্কারক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অবদান ছিল। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। বিধবা-বিবাহে তাঁর উৎসাহদান ও কার্যকরী ভূমিকা মনে রাখার মতো।

১৮৫১-তে দেবেন্দ্রনাথ ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪-তে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে তিনি দরিদ্র গ্রামবাসীদের চৌকিদারি ট্যাক্স থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে ঐতিহাসিক কাজ করে যান দেবেন্দ্রনাথ।

শিক্ষা-আন্দোলনেও তিনি ছিলেন বিশেষ অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। নিজের কন্যাকে সে-সময়েই তিনি বেথুন স্কুলে ভর্তি করেন।

বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশে তার উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি', 'পরলোক ও মুক্তি', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা', 'আত্মজীবনী' প্রভৃতি।

পিতৃঋণের বিশাল বোঝা মাথায় নিয়ে তাঁকে তা পরিশোধ করতে হয়। সর্বক্ষণ নানাবিধ সামাজিক দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। তাঁর মধ্য দিয়েই চালিয়ে গেছেন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গভীর অন্বেষণ। সৎ, ঋজু চরিত্রের কর্মযোগী এই মানুষটি দেশ ও দশের কাজে এক বিরল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ সহ তাঁর প্রত্যেকটি পুত্র-কন্যাই দেশবাসীর গৌরব। ১৯০৫-এর ১৯-শে জানুয়ারি এই মহামানবের মৃত্যু হয়।